International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Special Issue, June 2023, Page No. 83-89
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.iSpecial.2023.83-89

ঋগ্বৈদিক যুগের সামাজিক গঠন

ড.মৃন্ময় চক্রবর্তী
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, সংস্কৃত বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

An important era in the annals of ancient India is the Rig Vedic Period. This ranges from (1500 BC – 1000). According to scholars, the Vedic culture existed between the second and first millennia B.C.E. and lasted until the sixth century. Because the Vedic literature and the Vedas were created in this age on the Indian subcontinent, it is known as the Vedic Age or Vedic Period. The Vedas were influenced by the customs and way of life that prevailed during the Vedic Period. This article has all the details related to Rig Vedic period of Ancient history one of the important section.

Ten volumes, referred to as Mandalas, make up the Rigveda. 10,600 verses and 1,028 hymns make up this compilation. In any Indo-European language, it is the earliest text. As far back as 1700 BC, it had its beginnings. 35% of songs were written by the Angiras (a rishi family), and 25% of the Rig Veda was written by the Kanva family.

Numerous verses from the Rig Veda are still incorporated into important Hindu ceremonies and prayers. It offers a wealth of information on how the world came into being, the significance of the Gods, and how to lead a fulfilling and successful existence. According to the Rig Veda, Prajapati, the original God and the fundamental cause of existence, created the universe.

The hymns, referred to as Sukta, were written to be sung during ceremonies. The main god mentioned in the Rig Veda is Indra. Along with the older Aryan deities, the Rig Veda also contained other main deities that were significant. These included the sky God Varuna, the fire god Agni, and the sun god Surya. The Rig Veda attributes Lord Shiva, a Hindu deity, to the mountain and tempest god Rudra.

According to the Rig Veda, Lord Vishnu, one of the Trimurti of Hindu gods, was once a minor divinity. The Rig-Veda also contains the eminently well-known Gayatri chant (Savitri). This hymn mentions the varna system, the four divisions of society, "Sudra," Gamester's Sorrow, and Purusha Shukta Hymns

Rajan was the title of the government's leader. In the Rig Vedic Period, the Jana was the biggest political and administrative entity. "Kula" was the name of the fundamental

political subdivision. A "grama" is a collective term for several households. The "Gramani" was the "grama's" leader. 'visu' refers to a group of communities led by a 'vishayapati. Sabhas and Samitis were terms for tribal meetings. Tribal nations go by the names of Bharatas, Matsyas, Yadus, and Purus.

Women were permitted to join in Sabhas and Samitis and held respectable positions. Women writers like Apala, Lopamudra, Viswavara, and Ghosa were among them. The importance of cows among livestock increased. Although polygamy wasn't common, it existed among the families of aristocracy and nobility. The tradition of child marriage did not exist. Despite not being strictly observed and hereditary, social differences did exist.

The majority of Aryans were pastoral and livestock farmers. They worked in farmland. Chariots and ploughs were fashioned by carpenters. Workers used iron, brass, and copper to create a vast number of items. For the creation of cotton and woollen textiles, spinning was used. Ornaments were created by goldsmiths, and different types of household vessels were created by potters. Initially, trade was carried out through the barter system, but for significant deals, gold coins known as "nishka" were used…

Keywords: Rig Veda, Ancient.

প্রাচীনতম বেদ ঋগ্বেদের যুগে সমাজব্যবস্থা কেমন ছিল তা অনুসন্ধান করার আগে জানতে হবে বেদ কেন বিশেষ? তাই প্রথমে অতি সংক্ষেপে বেদের পরিচয় স্মরণ করে নেব। 'বেদ' কথাটির অর্থ জ্ঞান। প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারাও লাভ করা যায় না এমন জ্ঞান বেদ থেকে লাভ করা যায়, এই কারণেই বেদ অসাধারণ। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন -

"প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তুপায়ো ন বিদ্যতে । এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা।।"

সায়ণাচার্যের মতে ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের উপায় যে গ্রন্থ থেকে লাভ করা যায় সেটিই হল বেদ "ইস্টপ্রাপ্যনিষ্টপরিহারয়োরলৌকিকমুপায়ং যো গ্রন্থো বেদয়তি স বেদঃ।" মনুসংহিতায় মনু বেদকে অখিল ধর্মের মূল বলেছেন "বেদঃ অখিলধর্মমূলম্"। ধর্ম ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্ম, কর্মফল, যজ্ঞ, যজ্ঞফল, স্বর্গ, পরলোকতত্ত্ব, অদৃষ্ট ইত্যাদি চরম আধ্যাত্মিক জ্ঞান একমাত্র বেদ থেকেই লাভ করা যায়। ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চারটি বেদ আবার মন্ত্র বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদাদি স্তরে বিভক্ত আমরা জানি। যজ্ঞে প্রযুক্ত মন্ত্ররাশি বাদ দিয়েও ধর্মনিরপেক্ষসূক্ত, সংবাদসূক্ত, দার্শনিকসূক্তগুলিও বেদে সন্নিবেশিত। বেদের চারটি ভাগ হলেও মূল বেদ বলতে ঋগ্বেদকেই বোঝায়। কারণ বাকি বেদগুলি এই ঋগ্বেদের পুষ্টিতেই পুষ্ট, অথর্ববেদ কিছুটা ভিন্নধর্মী হলেও ঋগ্বেদাংশ বর্জিত নয়। যাই হোক, এই বৈদিক সাহিত্য পৃথিবীর প্রথম উপলব্ধ সাহিত্য হিসাবে স্বীকৃত। আর এই সাহিত্যে বিধৃত হয়ে আছে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ। সমগ্র বৈদিক যুগের বিস্তার ব্যপক। যে সমস্ত পন্ডিতরা বেদের কাল নির্ণয় করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে পথিকৃৎ হলেন অধ্যাপক ফ্রেডেরিক ম্যাক্সমূলার। এরপর বালগঙ্গাধর তিলক, সি.ভি.বৈদ্য, ইয়াকোবি, কাকাসু ওকাকুরা, ভি.বি কেটকার প্রমুখ গবেষকগণ বেদের কাল নিয়ে নিরলস গবেষণা করেছেন। বেদের কালরহস্য ভেদ করার চেষ্টা এখনও অব্যাহত। বহু তর্ক-বিতর্কের মধ্যে দাড়িয়েও বেদের সংহিতাভাগের সূচনা ৬০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের সূচনা ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ

নাগাদ হয়েছিল বলে বরিষ্ঠ গবেষকগণের মত অনুযায়ী মেনে নেওয়া যায়। অতএব সেই প্রাচীন কালের সামাজিক চিত্রপট প্রাচীনতম বেদ-ঋগ্বেদে কিরূপ বিধৃত আছে তা পর্যবেক্ষণ করা যাক। সমাজের ক্ষুদ্রতম একক পরিবার। পরিবার বলতে বোঝায় কতকগুলি মানুষের একসাথে বেঁচে থাকা। বেঁচে থাকতে গেলে কি কি লাগে? অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান তো একেবারে নূন্যতম প্রয়োজন, এছাড়া শিক্ষা-স্বাস্থ্য- বিনোদন-সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি। আর এই সকল কিছু পূরণ করার জন্য চাই জীবিকা। এইভাবে চলতে থাকা অনেকগুলি পরিবার নিয়ে ক্রমে গড়ে ওঠে সমাজ। স্বাভাবিকভাবেই ঐ পরিবার সমষ্টির প্রতিদিনের চলতে থাকা জীবনচক্রে যা যা সংযোজিত বা বিয়োজিত হতে থাকে সেগুলির নিরিখেই তৎকালীন সমাজের গঠনশৈলী বিচার করা হয়। ঋগ্বৈদিক যুগে মানুষের জীবনযাত্রা কেমন ছিল, সমাজের উপাদানগুলি ঠিক কতটা উন্নত ছিল তার একটা শব্দচিত্র অঙ্কন করা যা।

বসতি: সমাজ তৈরি হওয়ার আগে বসতি গড়ে ওঠে। সভ্যতার বিকাশে জল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ঋগ্বৈদিক যুগের বসতিও ছিল নদীকেন্দ্রিক । ঋগ্বেদের সপ্তম মন্ডলে কতকগুলি নদীর নাম পাওয়া যায় এবং দশম মন্ডলের ১০-৭৫-৫ মন্ত্রে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শুতুদ্রী, পরূষ্ণ্যা, অসিক্যা এবং বিতস্ত নদীর নাম পাওয়া যায়। অনুমান করা যায় যে আর্যগণ এই নদীসমূহের নিকটে বাস করতেন। সাতটি নদীর নাম উল্লিখিত হলেও এই স্থানটিকেই পন্ডিত পাঞ্জাব বা পঞ্চনদীর দেশ হিসাবে সমর্থন করেছেন। মনুসংহিতায় বর্ণিত আর্যাবর্তের ভৌগলিক সীমান্তেও এই মত সমর্থিত হয়েছে। নানা মুনির নানা মত থাকলেও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বেদবিদ্বান আচার্য সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় পাঞ্জাবের সুবাস্তু নামক জনপদটি আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল - এই সিদ্ধান্ত করেছেন। ঋগ্বেদের ১-১১৪-১, ১-৪৪-১০ মন্ত্রে 'গ্রাম' শব্দটির উল্লেখ আছে। এ থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, বৈদিক আর্যগণ তখন দলবদ্ধভাবে গ্রামে বাস করতেন। আবার ৭-১৫-১৪ মন্ত্রে লৌহ-নগরী বা লৌহনির্মিত দুর্গের উল্লেখও পাওয়া যায় ।

অরণ্য-নির্ভরতা: ফলমূল সংগ্রহ ঋগ্বেদের একেবারে প্রথম পর্যায়ের কথা। ৩-৩৫-৪ মন্ত্রে আঁকশি দিয়ে গাছের পাকাফল পাড়বার কথা উল্লিখিত হয়েছে

"বৃক্ষং পর্ব্বং ফলম্ অঙ্কীব ধনুহি"।

অরণ্যভূমিতে চাষবাসের সুযোগ না থাকলেও খাদ্য হিসাবে সুস্বাদু ফল সুলভ প্রাণিকুলের মাতৃভূমি বলে পরিচয় দিয়েছেন - 'মৃগানাং মাতরম্ অরণ্যানিম্।'[১] থাকায় বৈদিক ঋষি অরণাকে ওষধি বা বর্ষজীবি গাছপালাও অরণ্যে প্রচুর থাকে। ধান থেকে যেমন চাল পাওয়া যায় কিছুটা সেই ধরনেরই দানাশস্য অরণ্যের বিভিন্ন ঘাস থেকে সংগ্রহ করার রীতি ছিল প্রথম অবস্থায়।

কৃষি ও পশুপালন: এরপর কৃষিকর্ম শুরু হয়। ঋগ্বেদের ৮-৭৮-১০ মন্ত্রে পাকা ফসল কেটে জড়ো করার রীতি জানা যায়

'দিনস্য বা মঘবন্ত সম্ভৃতস্য বা।'

জমি থেকে গাছসমেত শস্য কেটে সংগ্রহ করে এনে ঝেড়ে নেওয়ার সঙ্গে শত্রুকে আছাড় মেরে পর্যুদস্ত করার তুলনা মেলে একটি মন্ত্রে - 'খলে না পর্যান্ প্রতিহন্মি ভূরি।'[২] চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় জলসেচ প্রণালীর উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদে –

''যা আপো দিব্যা উতবাস্রবন্তি খনিমিত্রা উতবা যাঃ স্বয়ংজা।
সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ পারকাস্তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু।''[৩]

'খনিমিত্রা' শব্দে কৃত্রিম জলসেচ ও 'স্বয়ংজা' শব্দে প্রকৃতিক জলসেচ প্রথা বোঝানো হয়েছে।

দ্যুতক্রীড়ার নিন্দা ও কৃষিকার্যের প্রশংসা করা হয়েছে অক্ষসূক্তে। ''অক্ষৈর্মা দীব্যঃ কৃষিমিৎ কৃষস্ব বিত্তে রমস্ব বহু মন্যমানঃ। তত্র গাবঃ কিতব তত্র জায়া তন্মে বিচষ্টে সবিতায়মর্যঃ।''[৪] অর্থাৎ পাশা খেলো না, কৃষিকার্য কর । কৃষিকাজ করলে বহু সম্মান ও বিত্ত লাভ করবে। রে দ্যূতাসক্ত ব্যক্তি কৃষিকার্যেই তোমার গাভী, জায়া লাভ হবে' - সবিতাদের ঋষির মাধ্যমে এই নিশ্চয়তা দিয়েছেন। অক্ষসূক্তের এই মন্ত্রটি থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, গাভী তখন মূল্যবান প্রয়োজনীয় গৃহপালিত পশু। এছাড়া পুষ সূক্তে মহিষ, অশ্ব, মেষ, অজ বিশেষভাবে দুগ্ধবতী গাভীর উদ্দেশ্যে অনেক স্তুতি পরিদৃষ্ট হয়। শুধু তাই নয় সেই পশুগুলি দেখাশোনা করার জন্য পশুপ বা রাখালও ছিল -

'পর্যগ্নি পশুপা ন হোতা।'[৫]

খাদ্যাভ্যাস: ঋগ্বেদে যবের উল্লেখ বহুস্থানে আছে । যেমন- 'গোভির্যবং ন চকৃষৎ।'[৬] প্রথম প্রথম যব শব্দটি যে কোনো দানাশস্যকে বোঝাত, তারপর তা নির্দিষ্টভাবে 'যব' বোঝাতে থাকে। ক্রমে খাদ্যতালিকায় অন্যান্য দানাশস্য যুক্ত হতে থাকে। যবের নানরকম পদ প্রচলিত ছিল। উপলপ্রক্ষিণী নামে পরিচিত মহিলারা উদুখলে শস্য গুঁড়ো করে ছাতু বানাতেন, তারপর চালুনিতে চেলে নিয়ে তা পরিষ্কার করে নেওয়ার রেওয়াজ ছিল - 'সঙ্কুমিব তিতউনা পুনন্তঃ।'[৭] পিঠে বা পুরোডাশ তৈরি করে যজ্ঞে নৈবেদ্য হিসাবে তার ব্যবহার অতি প্রসিদ্ধ ছিল । অরণ্য থেকে সংগ্রহ করা মধু, জল, গাভীর দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রী, সেইসঙ্গে দানাশস্য দিয়ে তৈরি খাবার, আর সোমলতার রস আর্যদের যজ্ঞবিধিতে এবং নিশ্চয় দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় খাদ্যতালিকার মূল্যবান উপকরণ হিসাবে গণ্য হত। কিন্তু এইসব সাত্ত্বিক খাবারের পাশাপাশি মাংসের প্রচলনও অতিমাত্রায় ছিল। যজ্ঞকর্মেও মাংসের আহুতি দিতে হত। ছাগ, অশ্ব, বন্ধ্যাগাভী, ষণ্ড, মহিষ বলি দেওয়ার কথা জানা যায়। এই বলির পরিমাণের উপর হয়তো আভিজাত্য নির্ভর করত, কারণ পঞ্চম মন্ডলের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে –

'সখা সখ্যে অপচভূয়মগ্নিরস্য ক্রত্বা মহিষা শ্রীশতানি।'[৮]

অর্থাৎ দেবগণ তিনশত মহিষের মাংস দ্বারা ভোজের আয়োজন করেছিলেন। রাজা ও ব্রাহ্মণরাও যে এই ধরণের মাংস আনন্দ সহকারে গ্রহণ করতেন তার বহু প্রমাণ ঐতরেয় ব্রহ্মণে, শতপথ ব্রাহ্মণে মেলে। এর সঙ্গে 'সুরা' নামে আর একটি উত্তেজক পানীয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেটি পান করলে নেশা হত। ব্রাহ্মণদের জন্য এই পানীয় নিষিদ্ধ থাকলেও সমাজে যথেষ্ট পরিমাণে তা ছড়িয়ে পড়েছিল।

বস্ত্র: ''তন্তুং ততং সংবয়ন্তী''[৯] মন্ত্রে পেশস্কারী বা সূচিশিল্পী মহিলার উল্লেখ থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে তখনকার পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি ছিল না। পরবর্তী ৭-৩৩-৯, ১০-৭১-৯ মন্ত্রেও সূচিকর্ম ও বয়ন শিল্পের একাধিকবার উল্লেখ রয়েছে।

বিবিধ জীবিকা: চাষের সরঞ্জাম ও অন্যান্য ছোটখাট যন্ত্রপাতি নির্মাণের দক্ষতা আয়ত্ত করে কিছু লোক জীবিকা সংস্থান করতেন। যাঁরা আকরিক ধাতুকে আগুনে পুড়িয়ে, হাতুড়ি পিটে লোহার পাত্র ইত্যাদি জিনিস

তৈরি করতেন তাঁরা কর্মার নামে পরিচিত কারুকৃৎ ছিলেন। ঋগ্বেদের ৫-১-৫, ৫-৩০-১৫, ৯-১-২ ইত্যাদি মন্ত্রে তার প্রমাণ মেলে ।

তুষ্ট অর্থাৎ ছুতোর মিস্ত্রি কাঠের জিনিস তৈরি করতেন। যার মধ্যে অন্যতম ছিল রথ

'রথং ন তুষ্টেব'[১০]

তৎকালীন নানা জীবিকার মধ্যে নৌকার দাঁড়ি বা মাঝিও ছিল –

'ইয়র্তি বাচম্ অরিতেব নাবম্।'[১১]

১০-১৪৩-৪৫, ৭-৬৮-৭ প্রভৃতি মন্ত্রে সামুদ্রিক পোতের কথা উক্ত হয়েছে । অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা ছিল ভিষক্, অর্থাৎ চিকিৎসক –

'কারুরহং ততো ভিষ।'[১২]

৬-৩-৪ মন্ত্রে স্বর্ণকার কর্তৃক স্বর্ণ ও অন্যান্য ধাতু গলিয়ে বিভিন্ন দ্রব্য নির্মাণের কথা জানা যায় । পাশিন্ বা শিকারিও একটি জীবিকা ছিল –

'পদে পদে পাশিনঃ সন্তি সেতবঃ ।' [১৩]

৬-৪৮-১৮, ৫-১-৫ মন্ত্রগুলি থেকে উন্নত চর্মশিল্পের কথাও জানা যায়।

১-১১৬-১৫ মন্ত্রে লৌহশিল্পকে কাজে লাগিয়ে উন্নত শল্যচিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল বলে জানা যায়। নানাবিধ যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণেও আর্যগণ সুদক্ষ ছিলেন। লৌহনির্মিত বস্ত্র, কুঠার, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রের উল্লেখ ১-৫২-৮, ১৮১-৪, ৭-৮৩-১, ৬-৩-৫ প্রভৃতি মন্ত্রে বারংবার পাওয়া গেছে।

গৃহনির্মাণ, দুর্গানির্মাণ, গ্রামপরিকল্পনা, পুষ্করিণীখনন, নলকূপ, কৃত্রিম জলসেচ প্রভৃতির উল্লেখ এই বেদে থাকায় পূর্বকর্মের পরিচয় পাওয়া যায় । উন্নত স্থপতিবিদ্যারও আভাস মেলে।

শাসনব্যবস্থা: পরিবারগুলি ছিল পিতৃতান্ত্রিক এবং রাজ্য ছিল রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আবদ্ধ বংশানুক্রমে দশপুরুষ ধরে রাজাদের রাজ্যশাসনের কথাও এই বেদে উল্লেখিত। ৭-৩৩-৩, ৭-৮৩-৬ প্রভৃতি মন্ত্রে এক বা একাধিক নৃপতির সাথে অন্যান্য নৃপতিদের যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায় । রাজার প্রধান মন্ত্রী থাকতেন পুরোহিত। ঋগ্বেদের বৃহস্পতিসূক্তের ৪-৫০-৮ মন্ত্রে বলা হয়েছে যে রাজা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পরামর্শ নিয়ে রাজ্য পরিচালনা করেন, প্রজাগণ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে।

ধর্ম: বৈদিক ধর্ম স্বাভাবতঃ যজ্ঞনিষ্ঠ ধর্ম। তখন দীর্ঘ আয়ু, বীরপুত্র, ঐশ্বর্য ইত্যাদির কামনায় দেবতাগণের স্তুতি পূর্বক যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হত। বহু দেবদেবীর উপাসনা প্রচলিত থাকলেও যখন যাঁর স্তুতি করা হত, তখন তাঁকে পরমেশ্বর রূপেই স্তুতি করা হত। বেদের দেবতাবাদের এই বৈশিষ্ট্যকে ম্যাক্সমূলার Henotheism Kathenotheism সংজ্ঞা দিয়েছেন। এইভাবে উপলব্ধ হয় যে প্রত্যেক দেবদেবী আসলে সেই ব্রহ্ম । একেশ্বরবাদের সূচনা এভাবেই।

এক

শিক্ষা: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য – এই তিনটি উচ্চবর্ণের জন্য শিক্ষা আবশ্যিক ছিল। উপনয়নান্তে গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য পালনের মধ্য দিয়ে বিধিপূর্বক শিক্ষালাভ করতে হত। নারীরাও এবিষয়ে সমান সুযোগ ও গুরুত্ব পেতেন । তাঁদেরও উপনয়ন প্রথা প্রচলিত ছিল। তাঁরা অধ্যাপনাও করতেন। ঋগ্বেদে বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, রোমশা, অস্তৃণীবাক, প্রমুখা নারী ঋষির নামও লিপিবদ্ধ আছে। শুধু তাই নয়, যুদ্ধক্ষেত্রেও পুরুষদের পাশাপাশি রমণীদের অপুর্ব বীরত্বের ও যুদ্ধকর্মের বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। সেগুলির মধ্যে ১-১১৬-১৫ তে বিপলা, ১০-১০২-২ মন্ত্রে মুদ্গলানী কর্তৃক শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন ও বীরত্বসূচক যুদ্ধের সুন্দর বর্ণনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এছাড়া জ্যোতির্বিদ্যাতেও তখন চরম উৎকর্ষতা সাধিত হয়েছিল।

অসাধুতা: আদর্শ মানুষ তৈরি হওয়ার জন্য নানাবিধ আয়োজন থাকা সত্ত্বেও অসাধু ব্যক্তিরা চিরকালই সমাজে বর্তমান থাকে, ঋগ্বৈদিকযুগের সমাজও তা থেকে রেহাই পায়নি। মদ্যপায়ী, চোর, দূত বা পাশাখেলায় আসক্ত ব্যক্তির উল্লেখ ও নিন্দা ঋসংহিতায় দৃষ্ট হয়।

বিনোদন: অশ্বধাবন ও রথধাবন প্রতিযোগিতা আর্যদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কণ্ঠসংগীত-যন্ত্রসংগীতের মাধ্যমেও বিনোদন ব্যবস্থা চলত। ঋক্সংহিতায় বীণা, কর্করি, দুন্দুভি, শততন্ত্রী, বাণ-বংশী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে। ১-১০-১ মন্ত্রে বংশদন্ড বা বাঁশের লাঠি নিয়ে নাচের কথাও বলা হয়েছে। এছাড়া চরম দুর্দশা নেমে এলেও পাশাখেলায় আসক্ত ব্যক্তিদের কাছে ঐটিই বিনোদন ছিল।

বিবাহ: ঋগ্বেদের ১০-৮৫ সূক্তে বিবাহ সংক্রান্ত মন্ত্রগুলি পাঠ করলে বিবাহ বন্ধনের গভীরতা ও পবিত্রতা, সমাজে নারীর সম্মানিত উন্নতস্থান অনায়াসে উপলব্ধ হয় । ১০-২৭-১১, ১২ মন্ত্রদুটিতে স্বয়ম্বর প্রথার উল্লেখ আছে । ১০-৪২-২ মন্ত্রে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ অর্থাৎ বিধবা বিবাহেরও নির্দেশ আছে । তৎকালীন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি কতটা স্বচ্ছ ও আধুনিক ছিল তা কি কল্পনা করা যায় ! বর্ণব্যবস্থা : দশম মন্ডলের পুরুষসূক্তে লিপিবদ্ধ আছে -

"ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ উরূ তদস্য যদ্বৈশাঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো আজায়ত।।"[১৪]

অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা পরমপুরুষের মুখ ব্রাহ্মণে পরিণত হল, বাহুদ্বয় ক্ষত্রিয় হল, উরুদ্বয় বৈশ্য হল এবং পদযুগল হতে শূদ্র উৎপন্ন হল। বোধহয় এর থেকে স্পষ্ট করে আর কোথাও চতুর্বর্ণ সম্পর্কে এমন ব্যাখ্যা করা হয়নি। পরমপুরুষকে সমাজ ধরে নিলেই প্রত্যেক বর্ণের অবস্থান ও গুরুত্ব বোধগম্য হয়। স্বল্প পরিসরে বিস্তৃত আলোচনা না করা গেলেও বলা বাহুল্য যে - এই সমস্ত কিছুর পরেও মানবিক মূল্যবোধগুলি নিঃশব্দে কাজ করে যায়। পারস্পরিক বোঝাপড়া, ব্যক্তিগত তথা পারিবারিক উত্থান পতন, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সব কিছুরই প্রভাব পড়তে থাকে মানবমননে -চিন্তনে, জীবনচর্চা - জীবনচর্যাতেও। সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে বাহন বানিয়ে পুঁথিগত বা অর্জিত শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে প্রত্যেকে প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে চায় এই চাহিদাটাই সমাজে পরিবর্তন এনে দেয়। মানুষের স্বভাবই হল ক্রমশ উন্নতির পথে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাওয়া। এক পা চলার ক্ষমতা থাকলে দুপা চলতে চাওয়া । আর দুপা চলবার সাধ্য থাকলে তিন পা এগোতে চেষ্টা করা

"একপাদ্ ভূয়ো দ্বিপাদো বিচক্রমে, দ্বিপাৎ ত্রিপাদমভোতি পশ্চাৎ।"[১৫]

এভাবেই মানবসভ্যতা যুগ থেকে যুগান্তরে পৌঁছায়। অতীত যদি গৌরবময় হয় তাহলে তা ভবিষ্যৎকেও উজ্জ্বল করে তোলে, ঐতিহ্য পরম্পরায় মানবজাতি সশ্রদ্ধচিত্রেও পূর্বপুরুষদের সম্মান জানাতে দ্বিধাবোধ করে না, বরং উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। যুগান্তরের ইতিহাসে সুপ্রাচীন ঋগ্বেদিক সমাজচিত্র তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্র:

১। ঋগ্বেদ ১০-১৪৬-৬ ২
২। ঋগ্বেদ ১০-৪৮-৭ ৩
৩। ঋগ্বেদ ৭-৪৯-২
৪। ঋগ্বেদ ১০-৩৪-১৩
৫। ঋগ্বেদ ৪-৬-৪
৬। ঋগ্বেদ ১-২৩-১৫ ৭
৭। ঋগ্বেদ ১০-৭১-২
৮। ঋগ্বেদ ৫-২৯-৭
৯। ঋগ্বেদ ২-৩-৬ ১০
১০। ঋগ্বেদ ১-৬১-৪ ১১
১১। ঋগ্বেদ ২-৪২-১ ১২
১২। ঋগ্বেদ ৯-১১২-২
১৩। ঋগ্বেদ ৯-৭৩-৪ ১৪
১৪। ঋগ্বেদ ১০-৯০- ১২
১৫। ঋগ্বেদ ১০-১১৭-৮

গ্রন্থঋণ:

ক) বেদের পরিচয় - ডঃ যোগীরাজ বসু
খ) সংস্কৃত সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ - করুণাসিন্ধু দাস
গ) সংস্কৃত শিক্ষক : ডঃ সঞ্জিত কুমার সাধুখা